ধারাবাহিক রচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

(নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যার পর)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রসঙ্গে

শ্রীমর ছিল photographic memory (আলোকচিত্রতুল্য স্মৃতি), শিল্পিসুলভ প্রতিভা, এবং সর্বোপরি কাব্যিক কল্পনা। যিশুখ্রিস্ট, বুদ্ধ ও কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে কেউ সন্দেহ বা আপত্তি করতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিয়ে আপত্তি অসম্ভব। কারণ ক্যামেরায় তোলা তাঁর ছবি ও কথামৃত। শ্রীম নিখুঁতভাবে কথামৃতের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন দিন, ক্ষণ, স্থান সমেত ঠাকুরের কথোপকথন, এমনকী সেদিন কারা উপস্থিত ছিল, কোন কোন গান গাওয়া হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি নতুন কিছু বলেছেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই প্রাচীন চিরন্তন সত্যের নতুন করে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলতেন : ''ওরে, নবাবী আমলের টাকা বাদশাহি আমলে চলে না।'' বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে মুদ্রার পরিবর্তন হয়। তেমনি পূর্ববর্তী অবতারগণ সেই সেই যুগের উপযোগী এবং তদানীন্তন কালের মানুষের জীবনে যেরূপ প্রয়োজন সেভাবে উপদেশ দিয়েছেন।

বর্তমান যুগপ্রয়োজনে যে-বাণী দরকার নতুন অবতার তাই-ই এনেছেন। একশো বছর আগে মানুষ আধুনিক ঔষধাদি জানত না। তারা লতা, পাতা, শিকড় প্রভৃতি নিয়ে ঔষধ তৈরি করে রোগের চিকিৎসা করত। এখনকার ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন। সময়ের ব্যবধানে ঔষধাদির পরিবর্তন হচ্ছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ''আমি এই অব্যয়যোগ সূর্যকে বলেছিলাম। কালক্রমে এই যোগ লোকে ভুলে গেছে। এইজন্য তোমাকে আজ সেই পুরাতন যোগই বললাম।'' (গীতা, ৪।১—৩) যে-ভগবান কৃষ্ণরূপে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই ভগবানই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেখিয়ে গেলেন কীভাবে গীতার উপদেশ জীবনে পালন করতে হয়।

তর্ককালে পুনরুক্তি একটি দোষবিশেষ, কিন্তু শাস্ত্রবিচারে সেটি দোষের নয়। 'ন মন্ত্রাণাং জামিতাস্তি'—অর্থাৎ আমাদের দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য শাস্ত্র একই উপদেশ অনলসভাবে বারবার স্মরণ করিয়েছেন বিভিন্ন শব্দ ও উদাহরণ দিয়ে।

কথামৃতে শ্রীম কেবল ঠাকুরের উপদেশই লেখেননি, তিনি ছবির মতো অপূর্ব পরিবেশ বর্ণনা করেছেন যাতে পাঠকমনে তা দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ কথামৃতের ২২ জুলাই

১৮৮৩-র বর্ণনা : ''ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণি মল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।... ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে 'পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন' সে ছবিখানিও আছে। আর-একটি বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় মূর্তিও আছে। তক্তপোশের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেঝের উপর কেহ মাদুরে, কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম-গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। বর্ষাকালে খরস্রোতা, যেন সাগরসঙ্গমে পৌঁছিবার জন্য কত ব্যস্ত! পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন-স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।'' এটি একটি ধ্যানচিত্র। শ্রীম তাঁর অনবদ্য লেখনী ও কল্পনার সাহায্যে সমুদ্রসঙ্গমে প্রবহমানা গঙ্গার সঙ্গে অধ্যাত্মপিপাসুদের রামকৃষ্ণ-মিলনের তুলনা করেছেন।

স্বামী ঋতজানন্দ লিখেছেন : ''কথামৃতের শুরু উপন্যাসের মত—পরিবেশের বর্ণনা, চিত্রবৎ ভাষা—যাতে পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিবেশ সহ দেখতে পায়। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে ফুলের বাগান, পুকুর, গঙ্গাতীরে মন্দিররাশি দেবভূমি বলে মনে হয়। কেউ যদি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ফিল্ম বা সিনেমা তৈরি করতে চায়, তার সব শ্রীমর কথামৃতের অপূর্ব বর্ণনা থেকে পাবে। কথামৃতের প্রতি আকর্ষণের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের মুভমেন্ট বা গতি, কথা, গান, স্থান, কাল ও উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় নিখুঁতভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোনও অবতারে এরূপ দেখা যায় না।

''কথামৃতের পাতায় আমরা পাই শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবন এবং কিভাবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন। ভক্তদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে এই দুঃখময় জগৎটাকে তিনি মজার কুটিতে পরিণত করেছিলেন। আবার তিনি নিজের ও অপরের দুঃখ যন্ত্রণার কথা বলেছেন এবং পরিশেষে ক্যানসারে ভুগে দেখিয়ে গেছেন যে জন্মগ্রহণ করলে এসব আসবেই আসবে। তিনি ছিলেন সুখদুঃখ ও নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে। তিনি মা জগদম্বার চিরসান্নিধ্যে বাস করতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছোট ঘরটিতে যা ঘটত, সেসব শ্রীম লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কি খেতেন, কিভাবে কথা বলতেন ও অপরকে অনুকরণ করে বালক ভক্তদের হাসাতেন। এভাবে শ্রীম ঠাকুরের মানুষভাবটা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।''[২৯]

কথামৃত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর খাঁটি বিবরণী। এটি গভীর অথচ সহজ, সাবলীল ও মর্মস্পর্শী। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সরল নির্ভেজাল গ্রাম্য ভাষা ও বাচনভঙ্গি অপূর্ব, মুগ্ধকারী। অনেকে বাংলা শেখে কথামৃত পড়ার জন্য। এভাবে তারা শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ মুখের কথা উপভোগ করে।

আমরা যখন কথামৃত পড়ি, এটির জীবন্ত বর্ণনা আমাদের মানসপটে শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত করে তোলে। আমরা কল্পনার দ্বারা দেখতে পাই দক্ষিণেশ্বরে এবং অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণের গতিবিধি, স্থান, কাল, পরিবেশ ও বিভিন্ন ব্যক্তি যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কোনও অবতারের এরূপ নিখুঁত, সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায় না। কথামৃত পড়ার সময় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য উপভোগ করি। মনে হয় তাঁকে কেন্দ্র করে সব সময় যেন উৎসব চলছে। আমরা মনে মনে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর থিয়েটার দেখা, নৃত্য, গীত, হাসিঠাট্টা, পূজা, ধ্যান, সমাধি আনন্দে উপভোগ করি। নিত্য কথামৃতপাঠ আমাদের জীবনে নিঃসঙ্গতা ও একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি দূর করে দেয়।

স্বামী ভজনানন্দ লিখেছেন : ''প্রত্যেক প্রধান

ধর্মের নিজস্ব শাস্ত্র আছে। এরূপ অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান, যেমন বেদ, অ্যাভেস্তা, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি। আমরা কি আর একটি ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করি? নিশ্চয়ই। কারণ এই শাস্ত্র অন্য সব শাস্ত্রের বৈধতা প্রমাণ করবে ও তাদের সমন্বয় সাধন করবে।... কথামৃত ওই প্রয়োজন সুন্দরভাবে সাধিত করেছে।"[৩০]

শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনি আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর, কারণ শ্রীম নিজে ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর দৈবী লীলার নির্বাক দ্রষ্টা ও সাক্ষী, আবার কখনও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তুলনাহীন। তাঁর অহং-জ্ঞান রামকৃষ্ণের সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তা না হলে শ্রীম কথামৃত—যা পৃথিবীর এক অনন্য ধর্মগ্রন্থ—লিখতে পারতেন না। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিখুঁতভাবে শ্রীম লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ও সমাধি, পূজা ও প্রার্থনা, স্বপ্ন ও দর্শন, কর্ম ও ভক্তি, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য, নৃত্য ও গীত, হাসিঠাট্টা ও অনুকরণ, সাধনা ও তীর্থযাত্রা, লৌকিক আচরণ ও মনস্তত্ত্ব, ধর্ম ও দর্শন, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রীম লিপিবদ্ধ করেছেন দেবদেবীদের সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তা, বিভিন্ন ব্যক্তি ও ভক্তদের কথোপকথন, ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও সহানুভূতি।

শ্রীম কথামৃতে লিখেছেন : ''ঠাকুর মার কাছে করুণ গদগদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন—'মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো! সব ত্যাগ করিও না মা!... মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক-একবার দেখা দিস! না হলে কেমন করে থাকবে। এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!' " (৫ জানুয়ারি ১৮৮৪)

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মঙ্গলাচরণ

শাস্ত্রগ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য লেখক মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীম সেই সনাতন রীতি অনুযায়ী শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের গোপীগীতা থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি কথামৃতের মঙ্গলাচরণরূপে ব্যবহার করেছেন। গোপীরা কৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন :

''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।/ শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

—তোমার কথামৃত তাপদগ্ধ জনগণের জীবনস্বরূপ, মুনিগণ কর্তৃক কীর্তিত, পাপসমূহের বিনাশক, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ ও সকল সম্পদের আকর। ইহা যিনি বিস্তৃতভাবে কীর্তন করেন, জগতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

বহু পণ্ডিত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তবুও মনে হয় যেন আরও অনেক কথা ওতে লুকিয়ে আছে। রাসলীলাকালে গোপীদের অহংকার হয়েছিল, তাই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। যেখানে অহংকার সেখানে ভগবান নেই। তারপর শুরু হল কৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বিরহবিধুর গোপীদের গীতি ও সকরুণ প্রার্থনা।

শ্লোকগুলি তাঁদের হৃদয় থেকে উৎসারিত এবং চোখের জলে সিক্ত। শুনলে পাষাণহৃদয়ও গলে যায়। অনুরাগ-অশ্রু জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি ধুয়ে দেয়।

নিস্তব্ধ নিশীথে যমুনাসৈকতে গোপীদের হৃদয়বিদারী ব্যাকুলতা, কান্না, আন্তরিকতা দেখে কৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হলেন।

শ্রীম এই মঙ্গলাচরণে ইঙ্গিত করছেন—ভগবান লাভ করতে হলে গোপীদের মতো নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জল দিয়ে অহংকারকে ধুয়ে ফেলো।

তব কথামৃতম্

তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। অমৃত খেলে মানুষ অমর হয়। কিন্তু ভগবানের কথা পান করে কে অমর হয়েছে? লোকে কথামৃত পড়ে, শোনে; কথামৃতের উপর বক্তৃতা দেয়, প্রবন্ধ লেখে; কিন্তু কথামৃত পান করতে জানে কজন? শ্রীভগবৎকথা পান করেছিলেন শাপগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎ। তিনি শুককে বলেছিলেন, 'গায়তঃ বিষ্ণুগাথা'। শুক সাত দিন সাত রাত ধরে গাইলেন ভাগবতের আঠারো হাজার শ্লোক, আর তা প্রাণভরে পান করলেন পরীক্ষিৎ, দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে। ভাগবতে বর্ণিত আছে—শুক কর্তৃক ভগবৎকথা শুনে রাজা পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে কুশাসনে উত্তরমুখে বসে মহাযোগসম্পন্ন সঙ্গরহিত ও সংশয়শূন্য ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেলেন। তক্ষক এসে তাঁর প্রাণহীন দেহকে কামড়াল, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি অমরত্ব লাভ করলেন।

কথামৃতকার শ্রীম বোঝাতে চাইলেন, কথামৃত পান করলেও পরীক্ষিতের মতো ব্রাহ্মী স্থিতি হবে।

পুরাণে আছে দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্রমন্থন করে অমৃতকুম্ভ উদ্ধার করেন। বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধরে অসুরদের বঞ্চনা করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে অমর করে দেন। উপনিষদেও আছে—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—যা দিয়ে আমি অমর হব না, তা দিয়ে আমি কী করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন : ''কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?... আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোন্‌খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বললুম, বাবা সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ-রস অমৃতরস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না; অমর হয়।" (৬ ডিসেম্বর ১৮৮৪)

তপ্তজীবনম্

ভগবানের কথা সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ঠান্ডা করে। ছাতিফাটা তৃষ্ণায় যেমন শীতল জল শান্তি দেয়, তেমনি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবগণের পক্ষে কথামৃত। শ্রীমর মর্টন স্কুলে কথামৃত পাঠ্য ছিল। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ বলত যে, এই বই বেচার ফিকিরে স্কুলে বইটি পাঠ্য করা হয়েছে। জনৈক শিক্ষক-মুখে সমালোচনা শুনে শ্রীম প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন, ''এই পড়ার ফল বুঝবে ছেলেরা যখন সংসারে ঢুকবে। 'সংসার জ্বলন্ত অনল', ঠাকুর বলতেন। আর আমরাও তা ভাল করে বুঝেছি। সংসারে প্রবেশ করে যখন দুঃখকষ্টের পেষণে দিশেহারা হবে তখন তাঁর অমৃতময়ী কথা মায়ের মতো বাঁচিয়ে রাখবে। এর একটা কথাও যদি মনে থাকে, উহাই তখন সংসার-সমুদ্রে ভেলার ন্যায় শান্তির সীমানায় পৌঁছে দেবে।''

জগতে সুখ-দুঃখ দুইই আছে। মানুষ কর্মের দ্বারাই সুখ ও দুঃখ পায়। এর জন্য অপরকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেদান্তশাস্ত্র সংসারসুখকে কুপিত ফণিনীর ফণার ছায়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক পথিক মরুপথে চলতে চলতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও রৌদ্রতাপে পীড়িত হয়ে সে একটু ছায়া দেখতে পেয়ে সেখানে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সে দেখল না যে ওই ছায়া গোখুরো সাপের ফণার ছায়া। ওই সাপের একটি ছোবলেই হবে তার মৃত্যু। এ-জগতে মানুষ তেমনি অজ্ঞানবশত মায়ার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। এই অজ্ঞানই মৃত্যু।

কৃষ্ণ বলেছেন : অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—এ-জগৎ অনিত্য ও দুঃখময়। সুতরাং

আমার ভজনা করো। যিশু বলেছেন : দুঃখভারে জর্জরিত যে যেখানে আছ, আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের শান্তি দেব। তেমনি কথামৃতে দেখা যায় ঠাকুর কীভাবে তাঁর গল্প ও অমর বাণী দিয়ে তাপিত মানুষের মনে শান্তি ও আনন্দ দিয়েছেন। কথামৃতে রয়েছে জগৎ ভোলার মন্ত্র।

কবিভিরীড়িতং

ক্রান্তদর্শী কবিরা শ্রীভগবানের কথার স্তুতি করেন। প্রতি অবতারের জীবন ও বাণী উপজীব্য করে সৃষ্টি হয় নূতন সাহিত্য, কাব্য, গাথা, গান; স্তবস্তুতি, নাটক, গল্প, সংগীত, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। কথামৃত অবলম্বন করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হবে। একবার গিরিশচন্দ্রকে তাঁর বিল্বমঙ্গল নাটকের সুখ্যাতি করায় তিনি বলেছিলেন, ''নাটক লেখা তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে শেখা।'' নরেন্দ্র বলেন, ''বিজ্ঞান তাঁর কাছে শেখা''; মহেন্দ্র মাস্টার বলেন, ''মাস্টারি শেখা তাঁর কাছে।'' শ্রীম কথামৃতে ধরে রাখলেন ঠাকুরের কিছু অমর কথা। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা শ্রীরামকৃষ্ণের কথার ভাষ্য। রাম দত্ত কলকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণী অবলম্বন করে। গিরিশ তাঁর বিভিন্ন নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ভাষা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ঠাকুর যদিও স্কুলের শিক্ষা পাননি, তবে স্বয়ং মা জগদম্বা তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলতেন, ''যদি এক কথায় বুঝতে পারো তো আমার কাছে এসো, আর লক্ষ কথায় বুঝতে চাও তো কেশবের কাছে যাও।''[৩১] ব্রাহ্মনেতা কেশব সেন প্রথম ঠাকুর সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তা জানতে পেরে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, ''কেশব, আমার সম্বন্ধে লিখে তুমি আমাকে বড় করতে চাও। ঐরূপ চেষ্টা কোরো না। মা যাকে বড় করেন সেই বড় হয়।''

কল্মষাপহম্

কথামৃত কল্মষ—কালিমা, পাপবোধ দূর করে দেয় মন থেকে। প্রত্যেক অবতারকে পতিতপাবনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। কথামৃত পাঠে ও শ্রবণে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন শুদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে ও তাঁকে চিন্তা করে গিরিশচন্দ্রের কলঙ্কিত জীবনে রূপান্তর হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি বলতেন, ''আমাদের দেখলে তোরা ঠাকুরের মহিমা আরও বেশি বুঝতে পারবি। দ্যাখ, তাঁকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি। ঠাকুর আমাকে দেবতা করে দিয়ে গেছেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রিস্টানদের পাপবোধ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, ''যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়।'' এক ব্যক্তি ঠাকুরকে বলে, ''আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?'' শ্রীরামকৃষ্ণ : ''তাঁর নাম গুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপপাখি; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণকীর্তনে চলে যায়। আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর নামগুণকীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়।'' (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩) কী ভরসার কথা!

শ্রবণমঙ্গলম্

মঙ্গলময় ভগবানের কথা শুনলে মঙ্গল হবেই হবে। শ্রীম বলতেন, ''ঠাকুরের প্রতিটি কথা মন্ত্র।'' জেনে বা না জেনে লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, তেমনি ঠাকুরের কথা শুনলে কল্যাণ হবে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, যেখানে ভগবানের নাম-গুণগান হয় না সেখানে সব মলিন হয়ে যায় এবং বিশ্রী গন্ধ সৃষ্টি হয়। ঠাকুর তাই কলকাতার বিভিন্ন ভক্তবাড়িতে গিয়ে উৎসব করতেন এবং কথা ও গানের দ্বারা দিব্য পরিবেশ তৈরি করতেন।

শ্রীম কথামৃতে লিখেছেন : ''একদিন ঠাকুর তাঁহার (অধরের) বাড়িতে গিয়াছেন। অধর বলিলেন, আপনি অনেকদিন এ-বাড়িতে আসেন নাই, ঘর মলিন হইয়াছিল; যেন কি একরকম গন্ধ হইয়াছিল। আজ দেখুন, ঘরের কেমন শোভা হয়েছে! আর কেমন একটি সুগন্ধ হইয়াছে। আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকেছিলাম। এমনকি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'বল কি গো!' অধরের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।'' (৬ ডিসেম্বর ১৮৮৪)

শ্রীমৎ

ভগবানের কথা শ্রী বা ঐশ্বর্যে পূর্ণ, সৌন্দর্যে ভরা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনবার জন্য দিগ্‌বিদিক থেকে লোক ছুটে যেত দক্ষিণেশ্বরে। তিনি নিজেই বলতেন, ''কী আশ্চর্য, আমি মূর্খ! তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এতে তো বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা।''

আততম্

তাঁর কথা সুদূরপ্রসারী এবং সহজপ্রাপ্ত। যেমন বেদ, বাইবেল, গীতা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত। বিভিন্ন ভাষায় কথামৃত অনুবাদ হয়েছে। এই অনন্য ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীর অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে ও যাচ্ছে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন যে তিনি পঞ্চাশবার কথামৃত পড়েছেন এবং এখনও তিনি প্রতিদিন পড়বার সময় নূতন আলোক দেখতে পান। সত্য কখনও পুরনো হয় না। এক আমেরিকান ভক্ত কথামৃত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন : ''এ গ্রন্থের একমাত্র ত্রুটি যে এর শেষ আছে'' : ''There is one defect in this book; it has an end.''

ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ

যাঁরা ভগবানের কথা বিতরণ করেন তাঁদের মতো আর দাতা নেই। অন্নদান, ভূমিদান, অর্থদান প্রভৃতি বাহ্য। ভগবৎকথা দান দাতা ও গ্রহীতাকে ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দেয়। এ-ধ্যান অজ্ঞানধ্বংসী। 'ভূরিদা জনাঃ'-র অপর অর্থ খুব উদারচিত্ত যাঁদের। সংসারের ভোগবাসনা যাঁদের চলে গেছে, যাঁরা কেবল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করতে চান তাঁরাই কেবল তাঁর কথা বলবার যোগ্য। ভগবান যাদের ইচ্ছা করেন কেবল তারাই তাঁর কথা বলতে পারে। আবার যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণই বলতে পারে।

কথামৃত একখানি বিশাল গ্রন্থ। এ দেখে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কথামৃতের মূল বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণও খুব মজার মানুষ ছিলেন। তিনি এমনকী হাসিঠাট্টার মাধ্যমেও ভগবৎকথা দান করে গেছেন—তাই 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে'—আদি, মধ্য, অন্ত সব জায়গায় সেই ভগবানের কথা। ঠাকুর বলতেন, ''আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না।''

ঠাকুর কাউকেই বিমুখ করতেন না। গলার ক্যানসারে যন্ত্রণার মধ্যেও লোকশিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন : ''একটি আত্মাকেও সাহায্য করার জন্য যদি আমাকে জন্ম জন্ম আসতে হয়, হোক না তা কুকুর-জন্ম, তবু তাতে আমার কষ্ট নাই।''[৩২]

পরবর্তী কালে শ্রীম ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা দেশবিদেশে ঠাকুরের অমর বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীম ঠাকুরের বাণী বহন ও দান করবার জন্য জন্মেছিলেন। কথামৃত তাঁর অমরকীর্তি ঘোষণা করবে চিরকাল। (*ক্রমশ*)

তথ্যসূত্র

২৯। *Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial,* p. 77,79
৩০। ibid, p. 85
৩১। সুরেশচন্দ্র দত্ত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ*, পৃঃ ১৬২
৩২। রোমাঁ রোলাঁ, *রামকৃষ্ণের জীবন* (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৪১৬), অনুবাদ : ঋষি দাস, পৃঃ ১৯৫